এক সন্ধ্যার আলাপ

সাক্ষাৎকার ঃ মীজানুর রহমান মীজান

(আহমদ ছফা -- কবি, ঔপন্যা১৬০সিক, প্রাবন্ধিক এই মানুষটি সম্পর্কে আমার ধারনা খুব বেশি ছিল না। বন্ধু কবি প্রবীর ভৌমিকের কাছ থেকে প্রায় প্ররোচিত হয়ে আমি তাঁর পাঁচটি উপন্যাস পড়ে ফেলি। পরে হাতে পড়ে তাঁর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি গ্রন্থ 'আহমদ ছফা বললেন'। যা থেকে 'এক সন্ধ্যার আলাপ' এর কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বক্তব্য। ঋজু বিশ্লেষণ ধর্মী এই সাক্ষাৎকারগুলি প্রত্যেকটিই প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ এক একটি প্রবন্ধ। ফলে পুনঃ প্রকাশের লোভ স ম্বরণ করতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল গোটা সাক্ষাৎকারের বইটাই প্রকাশ করি। কিন্তু আমাদের পত্রিকার পরিসর সীমিত এবং আর্থিক সংকুলান ও আয়ত্বের বাইরে। তাই কোনো একটি সাক্ষাৎকার থেকে নির্দিষ্ট কিছু অংশ পূনমুদ্রণ করলাম। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেও পাওয়া যাবে সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ব্যক্তি সম্পর্কের বিষয়ে আহমদ ছপার বলিষ্ঠ, সৎ এবং সার্বিক নির্মাণ পরিকাঠামোর কিয়দংশ। ------ সম্পাদক)

আপনি তো কবিতা লিখেন, উপন্যাস লিখেন, তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, কোন পরিচয়ে আপনি স্ব াচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

আমার নাম আ-হ-ম-দ ছ-ফা।

আপনি কি মনে করেন কোন সাহিত্যিকের জন্য কৃত্তিকার গহিন স্পর্শ অপরিহার্য?

যে কোনো মানুষ, শুধু সাহিত্যিক নয়, তাকে শেকড়ের দিকে যেতে হয়। শেকড়চ্যুত রাজনীতি বলুন, সাহিত্য বলুন, অর্থনীতি বলুন, সবটাই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

আমাদের শেকড়টা কি রকম?

আমাদের শেকড় আমাদের অতীত ঐতিহ্য।

আমাদের অনেক আগে থেকেই একটা পাওয়ারফুল কালচার ছিলো। যে কারণে প্রথম আর্যরা করতোয়া নদী পার হয়ে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু বৌদ্ধরা এলো জয় করলো। মুসলমানরা এল জয় করলো। যেটা আর্যেরা পারলো না, সহজে মসুলমান এবং বৌদ্ধরা কিভাবে পারলো?

প্রশ্নটা খুব পরিস্ফুট নয়। সামরিক জয় এবং সাংস্কৃতিক জয় একজিনিষ নয়। তবু আমার পদ্ধতিতে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি । আর্যেরা এই দেশ প্রথম জয় করতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত আর্যদের জয় ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে ত াদের বেগ পেতে হয়েছিলো। আর্যরা ঘোড়া এবং লোহার সাহায্যে তাদের চাইতে সমৃদ্ধ দ্রাবিড়দের পরাজিত করেছে। এই নদী-নালা হাওর-বাওড়ের দেশে ঘোড়ার অল্পই উপযোগিতা ছিলো। কারণ, বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল বছরে ছমাস পানিতে ডুবে থাকতো। সারা ভারতে তাদের অবস্থান সংহত করার পরেই আর্যরা বাংলা দখলের উদ্যোগ নিয়েছে। আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বাংলায় পড়েনি এটা ঠিক নয়। কিন্তু গভীরে শেকড় বিস্তার করতে পারেনি। তাই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব খুবই ক্ষীণ।

বুদ্ধদেব যখন তার মতামত প্রকাশ করতে বসলেন তিনি তো বেদ এবং ব্রাহ্মণের বিদ্ধে বিদ্রোহই ঘোষণা করলেন। আর্য

ধর্মের চাপে যে সকল জনগোষ্ঠী নির্যাতিত বোধ করেছিলেন তারা প্রথম চোটেই বুদ্ধদেবের ধর্মকে স্বাগতম জানায়। বুদ্ধদেব তো বলতে গেলে একরকম বাঙালীই। তিনি জন্মে ছিলেন নেপালে। দিনাজপুর থেকে দূরত্ব পঞ্চাশ ষাট মাইলের অধিক হবে না। সুতরাং বাংলা অঞ্চলের মানুষ, যেহেতু তারা নিপীড়িত বোধ করতেন প্রথম সুযোগেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেন। পালযুগের সময় সমগ্র ভারতবর্ষে গৌড় একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অর্জন করতে পেরেছিলো।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধরা ভারতের সব জায়গায় প্রভচত্ব হারাতে থাকে। অবশেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। সেন বংশ বাংলা দখল করে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুশাসন চালু করলো, কিন্তু জনসমষ্টি প্রাণের থেকে সেটা গ্রহণ করলেন না। তাঁরা মনে মনে একটা বৈরিতা পোষণ করেই যাচ্ছিলেন। তারপরেই তো মুসলিম আত্রমণ হলো। পরাজিত বৌদ্ধদের অনেকেই আপনা থেকে ইসলাম ধর্মটা কবুল করলেন।

কিন্তু আমরা দেখেছি ইসলামের নবীকে আরবে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁর অনুসারীদের সেটা করতে হয়নি। এটা কী কারণে হলো?

এটা একটা জটিল প্র। এখানে ধর্মপ্রচারকদের অস্ত্র ধরতে হয়নি, সেটা সর্বাংশে সঠিক নয়। হযরত আহজালাল খান জাহ ান আলি অনেকেই অস্ত্রের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ প্রচারের কারণেই এখানে অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, একেকটা সংস্কৃতির একেককটা আলাদা চরিত্র থাকে। আমার ধারণা মুহম্মদ যদি বাংলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করতেন চৈতন্যের মতো সংকীর্তন করে ধর্ম প্রচার করতেন। আর চৈতন্যকে যদি আরব দেশে জন্ম নিতে হতো তঁ াকেও মুহম্মদের মতো অস্ত্র ধারন করতে হতো।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কি একজন লেখকের জন্য জরী?

এই সামাজিক দায়বদ্ধতা শব্দটিও অতিব্যবহারে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। নতুন একটি শব্দবন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন দাগী ত্রিমিন্যালরাও এই দায়বদ্ধতা শব্দবন্ধটি যত্রতত্র প্রয়োগ করে থাকেন। আমার কথা হলো, লেখক যদি দায়বদ্ধতা স্বীকার না করেন, তাহলে তিনি লিখবেন কেন? অন্য কাজ করলেও তো পারেন। রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতা ও লেখকের দায়বদ্ধতা এক নয়। রাজনীতিবিদ বারবার মত ও দল পরিবর্তন করেও টিকে যেতে পারেন। একজন লেখকের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার কথা বলি। একবার শাহ্ মুয়াজ্জেম হোসেন আম াকে কলকাতায় বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। আমার অপরাধ, আমি শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শব্দটি বলিনি। এখন তিনি শেখ মুজিবের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করেছেন। আবার আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও তাঁর অসুবিধে হবে না। কিন্তু একজন সৎ লেখকের পক্ষে সেটা অসম্ভব। একজন লেখকের তাই ভুল করলে চলবে না।

বরাবর সত্যভাষণের জন্য আপনি নিন্দিত নন্দিত। তসলিমাকে নিয়ে আপনার একটা ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। অ াপনার দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হলো তসলিমা মৌলবাদী হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কৌতূহলজনক ও কৌতুকময়।

তসলিমা নাসরিনের কোনো বক্তব্যে চিন্তার প্রতিফলন নেই। চিন্তাহীন বক্তব্য সবসময় মৌলবাদকে উৎসাহিত করে। আর মৌলবাদ হলো সেই বস্তু যা অতীতকে ভবিষ্যতে স্থাপন করে আগামীর পথ দ্ধ করতে চায়। তসমলিমার কোনো বক্তব্যই চিন্তাপ্রসূত নয়। অন্যরা তাদের কথাগুলো তসলিমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছে। ভারতবর্ষ টাকা দিয়ে তাদের কথা তসলিমাকে দিয়ে বলিয়েছে। এখন ইউরোপ টাকা দিয়ে তাদের কথা তসলিমাকে দিয়ে বলাচ্ছে। যেহেতু কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমারা ইসলামকে শত্রু মনে করছে, তসলিমা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। টাকা পাওয়া নিয়েই তসলিমার কথা। যে টাকা দেবে তার কথা বলবে। এটা এক ধরনের পতিতাবৃত্তি। একসময় ইউরোপ আমেরিকা তসলিমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সেই সময় হয়তো কোনো আরব শেখ তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারে।

আপনি বলছেন, তসলিমা ভারতের ছুড়ে দেয়া কৃত্রিম উপগ্রহ যার কাজ হলো বাংলাদেশকে কৃষ্ণভাবে চিত্রিত করা। ইউরোপিয় পার্লামেন্ট জার্মানী, ফ্রান্সের মতো দেশ বাংলাদেশের মতো একটা ক্ষুদ্র দেশকে শত্রু মনে করবে কেন?

কথা তো সেটাই। ভারতীয় প্রচারযন্ত্র পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের বিদ্ধেই জনমত চলে গেছে। ভারতীয়রা বাবরি মসজিদ ভাঙার গ্লানি এবং লজ্জা ধামাচাপা দেয়ার জন্য তসলিমাকে সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম ারা এখন তাদের প্রয়োজনে তসলিমাকে ব্যবহার করছে। আগেই তো বলেছি কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামের বিদ্ধে প্রচার অভিযান পশ্চিমারা শু করেছে। তসলিমা সেখানে উপলক্ষ মাত্র।

ব্যাপারটা শদির মতো?

শদির সঙ্গে তসলিমার তুলনা করা যাবে না। শদি কোরান সংশোধন করতে বলেননি। কোরান, বাইবেল, বেদ, গীতা, ত্রিপিটক এগুলো মানতে পারেন, আবার নাও মানতে পারেন। কিন্তু সংশোধন করার প্র উঠবে কেন। শদি একজন বড়ো ম াপের প্রতিভা। তবে স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে যখন বিতর্ক উঠেছিল, আমি ঝুঁকি নিয়ে শদির অবস্থান সমর্থন করে নিবন্ধ লিখেছি। কিন্তু বইটি পড়ে মতামত পরিবর্তন করেছি। ওই বইটা একটা Bad art-এর দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। কিন্তু এই মহিল ার তো কিছু নেই। সে তো

শুধু কথা বলেছে। তার বাংলা গদ্যই হয় না।

আপনি বাঙালী 'মুসলমানের মন'-এ মুসলমানের স্বাতন্ত্রের কথা বলেছেন, ব্যাপারটা কি বাঙালী জাতিসত্তার প্রতি আত্মঘ াতী নয়?

আপনারা আমার রচনাটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন। আমি জাতি হিসাবে বাঙালী মুসলমানের অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অসহায়তার দিকটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বাঙালী মুসলমানেরা এদেশের মাটির আসল সন্তান। ত ারা প্রভুত্বকামী আর্যদের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত নয়, তেমনি আগ্রাসী তুর্কী তাতার, ইরানী তুরানীদেরও কেউ নয়। শু থেকেই বাঙালী মুসলমান একটা নির্যাতিত মানব গোষ্ঠী।

আমাদের দেশের নিষিদ্ধ মৌলবাদীরা এখন সংসদ এবং রাজপথ দু জায়গায় সচল। ঝি-পরিস্থিতি যেমন বসনিয়া, চেচেনিয়া, তুরস্ক, আলজিরিয়ার দিকে তাকালে, তাছাড়া আপনি যে বললেন কম্যুনিজমের পতনের পর ইউরোপ ইসল ামকে প্রতিপক্ষ করেছে। তার মানে পৃথিবী আরো একটা ক্রুসেডের দিকে এগুচ্ছে?

আমাদের দেশে মৌলবাদের পুনত্থান ঘটেছে সত্য। কিন্তু সমাজে মৌলবাদ পুরো প্রতিষ্ঠা কখনো অর্জন করতে পারবে না। ইসলামের বিদ্ধে পশ্চিমের একটা ভীতি আছে, কিন্তু ওটাই সব কথা নয়। আরো নানা রকম সুস্থ চিন্তার ধারাও তো সেখ ানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আবার একটি ক্রুসেড হবে, এটা খুবই সেকেলে এবং মধ্যযুগিয় ধারনা। আমাদের মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর ঝিাস ও আস্থা রাখা উচিত।

ইউরোপিয় ধাঁচে সাহিত্য আন্দোলন কি আমাদের এখানে হয়েছে?

এখানে পশ্চিমা ধাঁচে সাহিত্য আন্দোলন আমরা করবো কেন?

সদ্য চালু হওয়া পোষ্ট মডার্নিজম এটাও তো ইউরোপ থেকে আসা।

এই টার্মিনোলজিগুলোর মধ্যে হুজুগ কতোটা আছে সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। সাহিত্যে কোনো প্রকার এবং প্রকরণ বেঁধেদেয়া যাবে না। সৃজনশীলতার একটি নিজস্ব গতিবেগ আছে। ইউরোপ আজকের সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন কিছু দিতে পারছেনা। তার দেউলিয়াপনা চলছে বললে বেশি বলা হয় না। প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটছে লাতিন আমেরিকায়। ইউরোপ আমেরিকা শিল্প সাহিত্যের পোস্ট মর্টেম করছে। তা আমাদের বিশেষ কাজে আসবে মনে হয় না। লাতিন অ ামেরিকার দেশগুলোর সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা আমাদের মতো। অথচ সেখানে কলোসাস সাহিত্য ব্যক্তিত্ব জন্ম নিচ্ছেন। ইউরোপে একজন দস্তয়েভস্কি, একজন তল

স্তয় , টমাস মানের মতো যুগন্ধয় লেখকের কথা বাদ দিন, ক্যামু, সাঁত এঁদের মতো চিন্তাশীল লেখকের আবির্ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে না।

ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় নাকি দলগত স্পিরিট কাজ করে?

ঢাকার সাহিত্য আন্দোলন নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তাতে সাহিত্য বিষয়ের বিশেষ স্থান নেই। সাহিত্য এখানে র াজনীতির রক্ষিতা হিসাবে কাজ করে। তাতে করে রাজনীতি যেমন হয় না, তেমনি সাহিত্যও হয় না। আমাদের কোনো কে ানো প্রতিষ্ঠাশালী কবি এবং লেখক----- প্রতিষ্ঠাশালী এই অর্থে বোঝাচ্ছি দেশে এঁদের পরিচয় আছে এবং এলিট তথা নেতৃশ্রেণীর একাংশের মধ্যে তাঁদের সম্পর্ক আছে - রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন। আম ার মনে হয়, এগুলো পন্ড শ্রম। পন্ডশ্রম এ কারণে, এতে রাজনীতির কিছু হয় না, সাহিত্যেরও গতি হয় না। মাঝখানে কিছু লোকের লাফালাফি এবং আস্ফালনটাই সার। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য সাহিতি ্যক সমাজ বলতে এখানে কিছু নেই। সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনো সুস্থ প্রতিযোগিতা নেই, নেই সুস্থ মত বিনিময়। অধিকাংশ লেখক সাহিত্যিকদের

চিন্তাভাবনায় দেশ অনুপস্থিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকার কারণে সেন্স অব বিলংগিং সা হিত্যসেবীদের মধ্যে তৈরী হয়নি। সাহিত্যসেবীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র এবং স্বার্থপরতার গন্ডিঅতিক্রম করতে প ারে না।

এ ব্যাপারে ঢাকার বাইরের সাহিত্য সংগঠন বা সাহিত্য প্রতিভার প্রতি আপনার কোনো কথা আছে?

আমি লেখক শিবির তৈরী করেছিলাম এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলাম। আমি সারাজীবন সাহিত্যান্দোলন করে আসছি। এখনও একটি আন্দোলন গড়ে তোলার কথা চিন্তা করছি। গত পরশুদিন সেলিম মোরশেদ, সাজ্জাদ শরিফ, রাইসু এই সব ইয়াং ছেলেদের নিয়ে মিটিং করেছি। এই সময়ে এমন একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন দেশের সর্ব অঞ্চল তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নেপথ্য ভূমিকা রেখে যেমন বরিশাল ও অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্য সম্মেলনের অ ায়োজন করেছিলেন, সেরকম কিছু করতে পারলে বেশ হয়। দেশের একটি আত্মা আছে ওটা যাতে অনুভব করা যায়, জনগণের যে জীবনপ্রবাহ তার মধ্য থেকে প্রাণ এবং রস আহরণ করতে না পারলে সাহিত্যে সজীবতা আসবে না। অ াজকের লেখকদের বেশিরভাগ বুকিশ। তাঁরা টেলিভিশন কিংবা সিনেমার দিকে তাকিয়ে লিখছেন। এগুলোর কোনোটাই লেখা হচ্ছে না।

এক্ষেত্রে আমাদের কোনো করণীয় আছে?

আমি বলবো প্রথম করণীয় সৎ হওয়া, দ্বিতীয় করণীয় সৎ হওয়া, তৃতীয় করণীয় সৎ হওয়া। এর চাইতে বেশি আমার বল ার নেই।

শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক গদ্য পদ্য ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের ছাত্রের লেখার মতো। কথাটা আপনিও বলেছেন। আর আল মাহমুদের কবিতার ব্যাপারে কথা উঠছে , কিন্তু তিনি বলেছেন এখন কবিদের গদ্য লেখার সময়।

শামসুর রাহমান সাহেবের অনেক মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। তারপরেও আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটা রীতি আছে। তাঁকে সর্বাংশে ছোটো করার চেষ্টা করলে আমি নিজেই ছোটো হয়ে যাবো এবং একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো। তারপরও নানা প্রশ্নে পাঁচ-সাতবার শামসুর রাহমানকে চ্যালেঞ্জ করেছি কর্তব্যবোধের তাগিদে। আল মাহমুদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক বরাবরই ছিলো। একসময় আমরা একসঙ্গে তো জাসদই করতাম। আল মাহমুদ কবিদের এখনই গদ্য লেখার সময় কেন বলেছেন, অন্যসময় কি কবিদের গদ্য লেখার সময় ছিলো না? গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, পুশকিন এই সকল দিকপাল কবি কি গদ্য লিখেন নি? আসলে মাহমুদ একটা চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস এবং গল্প আমি পড়েছি। ভাষায় একটু বাহাদুরি আছে। কিন্তু মূল বিষয়বস্তু তুচ্ছ। মানুষ কতো আদনা জিনিশকে নিয়ে অহঙ্কার করে!

ভাষার ব্যাপারে আপনি কি কবিতার আবহের কথা বলছেন?

আপনারা এখন তণ। একটা কথা বলবো। দেখবেন, রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য লিখেছেন, পুরো দায়িত্ব নিয়ে লিখেছেন। আল ম াহমুদরা পলিটিকসের কাকতাড়ুয়ার ভূমিকা পালন করতে গেয়ে একটা মস্ত পাপ করে যাচ্ছেন। একজন লেখক বা কবি যখন নিজের ভেতর থেকে সত্য আবিষ্কার করতে পারেন না, তখনই তিনি পলিটিকসের কাছ থেকে লাঠি ধার করেন। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক সময়ে লেখক কবিদের রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে হয়। তার অর্থ বিশেষ কোনো র াজনৈতিক দলের হর্ন হওয়া বোঝায় না। আল মাহমুদ আমাদের একজন মহৎ কবি থেকে বঞ্চিত করলেন। He had all the making of a major poet.

আল মাহমুদ যে সব গদ্য লিখেছেন, সেগুলো কাজের জিনিস হয়ে ওঠেনি।

আপনি তো তণদের সৎ হতে বলেন। সাহিত্যের প্রকরণ ধরণ-ধারণ এ সম্পর্কে পরামর্শ বা উপদেশ .....

উপদেশ দেওয়া অর্থহীন। অনুভূতির সততাই প্রকরণ নির্ধারণ করে দেয়। যার নেয়ার ক্ষমতা আছে বিনা উপদেশেই নিয়ে ফেলবে। দুঃখের কথা হলো, তণরা পড়াশোনা করতে চায় না। অল্প মূলধনের লাভও তো অল্প। ক্লাসিক লিটারেচার কেউ পড়তে চায় না। সকলে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলতে চায়। সাহিত্যের শিক্ষকেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেকটা উৎপাত। ভার্ব, টেন্স মিলিয়ে ইংরেজী বলতে পারাটাই এখানে যোগ্যতা বলে গণ্য করা হয়। সিমেন্টের মেঝেয় পানি ঢ াললে যেমন গড়িয়ে যায়। এদের অবস্থাও দাঁড়িয়েছে অনেকটা সেরকম। মানস কর্ষনের একটা ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে কেউ ভাবনা চিন্তা করে না।

আমাদের ভার্সিটিগুলোতে ল্যাংগুয়েজ তেমন একটা পড়ানো যায় না। পড়ায় তো লিটারেচার।
লিটারেচারের মধ্য দিয়েই তো ল্যাংগুয়েজ পরিশুদ্ধ হয়।
একটা ব্যাপার আমরা দেখেছি, যেমন আমরা ইংরেজীর ছাত্র, আমরা তাকিয়ে থাকি ইন্ডিয়া দিকের টেক্সুয়াল সহযোগী কোনো বই নেই, এর কারণ কী?
এটা প্রধান কারণ বাণিজ্য। ভারতে ইংরেজী বইয়ের বাজার অনেক বেশি সম্প্রসারিত। ভারতে যদি কিপলিং বা শেক্সপীয়রের ওপর বই লেখা হয়, হাজার হাজার কপি কাটবে। আর এখানে কয়েকশোও কাটবে না। এখানকার অনেক ম াস্টার সাহেবরা ফালতু পন্ডিতি জাহির না করে যদি উৎকৃষ্ট নোট বই লিখতেন, অনেক ভালো হতো। আমার উস্তাদ ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই নোট লেখার কাজটি মুক্তধারায় শু করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আমাদের এখানকার সমস্যা হচ্ছে পাঠক সংখ্যা খুবই অল্প। এখানকার শিক্ষকেরাও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে চান না। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ আছে। ওখানকার শিক্ষকেরা দায়িত্ববোধ নিয়ে করেন। এখানকার গোট া শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। ইংরেজী জানা মানুষদের ভাড়া খাটার এতো জায়গা আছে পুস্তক লেখার সময় কোথ ায়?
এখন তো প্রকাশনার সংকট চলছে। আমাদের প্রকাশকেরা ভারত থেকে বই ছাপিয়ে আনছেন।
এটাকে যে কোনো ভাবে থামাতে হবে। আমাদের প্রকাশনা শিল্প বাঁচাতে হবে। পুস্তকের মুদ্রণব্যয় কমাবার জন্য সুলভ ক াগজ এবং অন্যান্য গ্রন্থ সামগ্রী প্রকাশকের কাছে সরবরাহ করতে হবে। স্টেডিয়ামে খেলার সময় এক মিনিট ফ্লাড লাইট জ্বালাতে আট দশ হাজার টাকা খরচ হয়। খেলা জরি বুঝলাম। কিন্তু পড়াশোনাটি কি অপ্রয়োজনীয়? সরকারকে ভর্তুকি দিতে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। আমরা তো একটা জাতি। জাতীয় প্রকাশনা সৃষ্টি করার চেষ্টা আমরা করবো না কেন?
ফারাক্কার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?
ফারাক্কার ব্যাপারে বরাবরই আমি একটা স্ট্যান্ড নিয়েছিলাম। খুব সম্ভবত ভারত আমাদের নয়, পশ্চিমবঙ্গকেও এ পানি দেবে না। আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। দুর্বৃত্ত প্রতিবেশির কৃপার ওপর নির্ভর করা আমাদের উচিত হবে না। বেগম জিয়া রাষ্ট্র সংঘে ফারাক্কা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এটা ভোট পাওয়ার একটা ফন্দি। এতে পানি আসবেনা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় গেলে পানি নিয়ে আসবেন বলেছেন, এটাও একটা ভাঁওতা। ভারতবর্ষের ভেতরে কাবেরি নদীর পা নির হিস্যার দাবিতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী অনশন ধর্মঘট করেও পানি পাননি। সবচাইতে দুঃখের হলো, এখানকার লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে ফারাক্কার ব্যাপারে কোনো রকমের দাহ কিংবা দুশ্চিন্তা নেই। একটা কুকুরও তার এলাকায় অনধিক ার প্রবেশকারী দেখলে অন্তত ঘেউ ঘেউ করে। লেখক সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিদের এক নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ----- এটা একটা ক্ষমাহীন অপরাধ।
আমি পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুদের বলেছিলাম, বাঙালীদের সদ্ভাব নষ্ট হওয়াটা ঠিক নয়। আমরা নিজেদের খরচে রাজশাহীতে ফ ারাক্কার কাছে একটা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন করবো। আপনাদের নিমন্ত্রণ করবো। আপনারা আসুন এবং ভারতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। তাঁদের কাছে আমাদের পানির দাবির ন্যায্যতার কথাটা তুলে ধন।
ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাঁরা বাংলাদেশের চারকোটি মানুষের মরণপণ সংকটের চ াইতে তসলিমার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। মানবাধিকারের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের ধরণটা এইরকম। আমাদের ভাগ্য অ ার কী! আমরা এই ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের কাছেই সুবিচার প্রত্যাশা করছি!
ভারতবর্ষ ফারাক্কাকে নিয়ে নতুন যে অপকৌশল আশ্রয় নেবে সেটা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তারা বলবে, হ্যাঁ অল্প সল্প পানি আমরা তোমাদের দিতে রাজি আছি। তোমরা আমাদের রেলওয়ে ট্রানজিট দাও। বন্দরের সুবিধা দাও, গ্যাস বিক্রি করো। ভারতের ভক্তরা এই ধরণের একটা চুক্তির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য পত্র-পত্রিকায় এরই মধ্যে প্রচ ার অভিযান শু করে নিয়েছে। এটা যদি কার্যকর হয় বাংলাদেশকে বিভাগপূর্ব আমলের অবস্থায় ফেরত যেতে হবে। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত ভারতের Hinter landবা পশ্চাদভূমিতে পরিণত হতে হবে।
তথাপি আমার একটা বিশ্বাস আছে, বাংলাদেশকে একেবারে কাবু করা যাবে না। বাংলাদেশের জনগণের উত্থান শক্তি হরণ

করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তথাপি আমি শান্তির কথা, সমঝোতার কথা বলবো। প্রতিবেশিদের মধ্যে বিবাদ ভালো নয়। আমাদের যেখানে কল্যাণ নেই, ভারতেরও সেখানে কল্যাণ থাকতে পারে না।

আপনি কি এখনো একই কথা বলছেন?

হ্যাঁ একই কথা বলছি। অন্নদাশঙ্করের স্ত্রীকে আমি মার মতো মনে করতাম। কোলকাতাতে আমার একজন মা আছেন। শিবনারায়ণ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক আলোচনা সভায় আমার লেখাকে ক্যামু কাফকার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সি.পি. এম. পার্টির মধ্যে আমার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনেকের সঙ্গে এখনো আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। অথচ আমার এমন কপাল যে পশ্চিমবাংলার এই সব সুহৃদ এবং হিতৈষীদের বিপক্ষে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে এবং অবস্থান গ্রহণ করতে হচ্ছে। এইসব কথা যখন ভাবি, কুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনের যেমন হয়েছিল, বেদনায় অ ামার মন ছেয়ে যায়। অথচ জীবনের ধর্মই এমন যে, মতদ্বৈততা এবং সংঘাতের পথ পরিহার করার কোনো উপায় নেই। আমি পশ্চিমবাংলার বন্ধুদের বলেছি তসলিমা ইত্যাদি তুচ্ছ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে চিহ্নিত করা এবং বাংলাদেশকে মৌলবাদে ঠেলে দেওয়ার আপনাদের উচিত হবে না। এ কারনে আখেরে আপনারাই বিপদে পড়ে যাবেন এবং নিজেরাই মৌলবাদের শিকারে পরিণত হবেন। ইতিহাসের সঠিক পাঠ গ্রহণ করতে চেষ্টা কন, বাংলার মুসলমানেরা বাংলা বিভাগ করার জন্য অতটা দায়ী নয়, যতোটা দায়ী কংগ্রেস এবং হিন্দু চরমপন্থীরা। আপনাদের কে ানো কাজে যদি এখানকার মৌলবাদীরা প্রবল হয়ে দাঁড়াবার মওকা পেয়ে যায়, তখন আপনারা তাদের খতে পারবেন না। আমাদের তো সংকটের অন্ত নেই। ডানে মোল্লা, বামে হিন্দু চরমপন্থী এবং সামনে পশ্চিমা দেশগুলোর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠ ানের শোষণ। ওই সমস্ত সংকট আপনাদেরও আছে। আপনাদের যেমন সেক্যুলারিজম প্রয়োজন, আমাদেরও সেক্যুলা রিজম প্রয়োজন। তবে আমাদের সেক্যুলারিজম আমাদের সমাজের মধ্যেই বিকশিত করে তুলতে হবে। আপনাদের সেক্যুলারিজমটা চাপিয়ে দিলে ধর্মধবজীদের বাধা দেয়া আমাদের কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ একেবারে ফেলনা নয়। কিন্তু ধর্ম যদি সমস্ত জীবন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সেটা হবে মারাত্মক।

আমাদের একেবারে পর মনে করবেন না। কথাটা বলা একটুখানি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তথাপি আমি সাহস করে বলবো, আমর া তো অংশতঃ হিন্দুই । আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মানুষ এখনো আমাদের হিন্দু বলে ডাকে। কোরান হাদিস ওগুলো আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য একথা সত্য। কিন্তু আমরা বেদ, গীতা, উপনিষদ এগুলোও তো পর মনে করিনে। এত সমস্ত গ্রন্থ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ যে সকল মহারথীরা আছেন তাদের কেউ রচনা করেননি। এগুলো এই ভারত ভূমির মূল্যবান সম্পদ। আমরাও তো এই মৃত্তিকার সাক্ষাত সন্তান। এগুলোর ওপর আমাদের দাবি এবং অধিকার আছে। সেট া তো কেউ খারিজ করতে পারবেনা। মুসলমান সমাজের মারাত্মক ভুল হলো ঐতিহ্য সম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এই কারণে চারটি প্রধান সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও মুসলমানেরা বিশেষ লাভবান হতে পারেনি।

আপনি তো ঐতিহ্যের কথা বলছেন। কিন্তু মুসলমানেরা কোরান হাদিসকে গ্রহণ করেছে, হিন্দুরা বেদপুরাণকে গ্রহণ করেছে, দুটোকেই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে আপনার মতে সকলে সহনশীল হয়ে উঠবে। কিন্তু সবাই তো সহনশীলতার পরিচয় দিতে রাজি নন।

এই প্রশ্নটা খুবই স্পর্শকাতর। একটুখানি এদিক ওদিক হলেই মানুষ ভুল বুঝতে পারে। মানুষের ইতিহাসের শিক্ষাই এই যে মানুষকে সহনশীল হতে হয়। যেখানে সহনশীল হওয়া প্রয়োজন, সেখানে সহনশীল হতে না পারলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। একজন মুসলমান একজন হিন্দুকে খুন করতে পারে, যেহেতু সে আপন ধর্মের মানুষ নয়। তেমনি একজন হিন্দুও একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে যেহেতু সে মুসলমান। হিংসা বিদ্বেষ দিয়ে কখনো মানুষ গরীয়ান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেনি। হিংস া হিংসার জন্ম দেয়, বিদ্বেষ বিদ্বেষের। শঙ্করাচার্যের সময়ে এক কোটি বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছিলো। তিনি এমন বিধান দিয়েছিলেন যে তুমি একজন বৌদ্ধকেও যদি হত্যা না করো, তোমার সাত পুষের নরকবাস হবে। তার ফলে এই দাঁড়াল যে রক্তপাতের কারণে ভারতবর্ষ এমন দুর্বল হয়ে পড়লো, মুসলমানেরা যখন আক্রমণ করে বসলো, প্রতিরোধ করার ক্ষমতাই তাদের রইলো না।

আধুনিক জাপানের কথা বলি। জাপানীদের একটা ধর্ম আছে। তাদের রাজা শিন্তো ধর্মাবলম্বী। সেখানে বৌদ্ধরা সংখ্য াগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাছাড়া খ্রিষ্টানও আছে। সেখানে সামাজিক শান্তি কিভাবে রক্ষিত হয়। জাগতিক এবং ধর্মগত

বিদ্বেষের কোনো সংবাদ আমি অন্ততঃ শুনিনি।
আমি সেদিন ভ্যাটিক্যান দূতাবাসে গিয়েছিলাম। কবির চৌধুরী সাহেবও ছিলেন। একজন খ্রীষ্টান যাজক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক এবং দেশগত হিংসা সম্পর্কে আমার কী মতামত? আমি জবাবে বলেছিলাম, আল্লাহত ালার কী ইচ্ছা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমরা সাদা কালো ,বাদামী পীত, হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, বৌদ্ধ, শিখ সকলের জন্য একটাই পৃথিবী। এই পৃথিবীর শান্তি আমাদের রক্ষা করতে হবে।
আমাদের এখানে আপনার প্রিয় লেখক কে কে আছেন?
এককভাবে প্রিয় লেখক কেউ নেই। বিশেষ লেখকের বিশেষ বই আমার ভালো লেগেছে। ভালো লাগা বইগুলো হলো, হুমায়ূন আহমদের 'নন্দিত নরকে', আখতাজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', হাসান আজিজুল হকের ছোটো গল্পগুলো, শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', শওকত ওসমানের 'জননী', শাহেদ আলীর কোনো কোনো ছোটো গল্প, রাজিয়া খান আমিনের 'বটতলার উপাখ্যান', মঞ্জু সরকারের 'তমস'। সেলিম আল দীনের নাটক 'কেরামতমঙ্গল', সত্যেন সেনের সেয়ানা, 'আলবেনী' এইসকল বই। আমি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'লাল সালু' এবং তাঁর দুটি নাট্যকর্ম বিশেষ মর্য াদা দিয়ে থাকি। আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি', আলাউদ্দিন আল আজাদের কোনো কোনো গল্পের কথা অবশ্যই উল্লেখ করবো। আমার পছন্দের তালিকায় আরো কিছু লেখকের বই আছে। এই মূহুর্তে মনে পড়ছে না।
কবিদের মধ্যে আপনার পছন্দ?
থোড়া বড়ি খাড়া ---- খাড়া বড়ি থোড় ওই তিনজন। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এবং নির্মলেন্দু গুন। শামসুর রাহম ানের চি, আল মাহমুদের দাহিকা শক্তি এবং নির্মলের স্বতঃস্ফূর্ততা আমার ভালো লাগতো। অবশ্য এসব অতীতের ব্যাপ ার। এখন তিনজনের কারো কবিতা আমার ভালো লাগছে না। নতুন কবিদের কাউকে এখনো বিশেষভাবে পছন্দ করতে প ারিনি। কবি পছন্দ করা প্রেমেপড়ার মতো ব্যাপার। শামসুর রাহমানের সঙ্গে একটা প্রেমে পড়ার সম্পর্ক ছিলো। কুটিল সময় সেই সম্পর্কটি নষ্ট করে ফেলেছে।
ব্যক্তিক সম্পর্কটি কি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ?
উচিত না। কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্যও কি করা যায়? আমি তো বলেছি শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার প্রেমে পড়ার মতো একটা ব্যাপার ছিলো। তার কারণ ছিলো মুখ্যত কবিতা। আল মাহমুদের সঙ্গেও একটা সুসম্পর্ক ছিলো। আমরা তো পরস্পর কমরেডই ছিলাম। এখন শামসুর রাহমান আর আল মাহমুদ কেউ কবি নেই। সৃজনশীলতার ক্ষেত্র অতিক্রম করে দুজনে দু'ধরনের লাঠি বগলে নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। শামসুর রাহমান নিয়েছেন রাজনীতির লাঠি, আল মাহমুদ ধর্মের লাঠি। উনাদের কাছ থেকে তণ সমাজের পাওয়ার কিছু নেই। তাঁরা সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।
অনেকে বলছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনীতি ব্যবহার করেছে।
কথাটি দুদিক থেকে সত্য। মাণিককে যেমন রাজনীতি ব্যবহার করেছে, তেমনি মাণিকও রাজনীতিকে ব্যবহার করেছেন। এসব হলো গিয়ে বাইরের কথা। মাণিকের সাইকের মধ্যে একটা বিভাজন লক্ষ করা যায়। তাঁর দিনপঞ্জি যাঁরা পড়েছেন, বুঝতে পারবেন। মাঠে বিপ্লবের কথা বলে ঘরে এসে মা মা বলে কান্নাকাটি করছেন। মা মা বলার মধ্যে দোষের কিছু অ াছে আমি মনে করিনি। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসটাকে গোপন প্রিয় অসুখের মতো লালন করা এবং প্রকাশ্যে অস্বীকার করা, এটা এক ধরণের সাহিত্যিক পাপ। মাণিকের শেষের লেখাগুলো তাঁর দোলাচল মানসিকতার জন্য উৎরায়নি। অথচ তাঁর প্রথম দিকের রচনাসমূহ কী বিস্ময়কর।
একটা কথা প্রচলিত আছে, অনুবাদ করার পরও যে কবিতাটির আবেদন নষ্ট হয় না, সেটিই আসল কবিতা।
কথাটি গ্যোতের। তিনি শেষ জীবনে তাঁর ফাউস্টের ফ্রেঞ্চ অনুবাদটাই বারবার পড়তেন। এই ফাউস্টটা আমি অনুবাদ করেছি। এটি অনুবাদ করার সময় একটা অনুভূতি ফুলের গন্ধের মতো মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে রাখতো, যে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এখন মাঝে মধ্যে ফাউস্ট অনুবাদটি পড়ে দেখি, মনে হয় আমি নই, অন্য কোনো মানুষ কাজটি করছে।

(সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিলো ঊনিশশো চুরানব্বই সালের জানুয়ারী মাসে এবং সংস্কার করে নতুনভাবে লেখা হয়েছে পঁচানব্বইয়ের নভেম্বর মাসে। আমরা তাঁর 'আহমদ ছফা বলছি' বইটি থেকে নির্দিষ্ট কিছু অংশের পূনর্মুদ্রণ করলাম।)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com